Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-2, Issue-iv, published on October 2022, Page No. 399–406
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848 (Online)

এক উত্তাল দশকের ডায়েরি : অথঃ 'মর্জিমহল কথা'

পৃথা দাস
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
ই-মেল : namespritha@gmail.com

Keyword
বনফুল, ডায়েরি, সমকাল, রাজনীতি, সংস্কৃতি, কথাসাহিত্য, তুলনামূলক আলোচনা, সমালোচক বনফুল।

Abstract
আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার বিদ্যায়তনিক পরিসরে ডায়েরি অজ্ঞাত না হলেও কিছুটা অবহেলিত। সিলেবাস – নোট- পরীক্ষার হলেই তার ঘোরাফেরা, আপাত-সীমাবদ্ধতা। এই আপাতত-উপেক্ষিত বিষয়টিই আমাদের এই গবেষণাপত্রের মূল উপজীব্য। মূলত ডায়েরি বা দিনপঞ্জি বলতে বোঝায় একটি দিন কীভাবে অতিবাহিত হলো বা একটি দিনের নানান ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী। যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দিন, মাস, বছর, বা সময়–চিহ্নিত। সমসময়ের যে অভিঘাত তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল ডায়েরি। ডায়েরি যে কোনও মানুষ লিখতে পারেন। তবে যখন কোনও সাহিত্যিক ডায়েরি লেখেন তখন তার আবেদন পাঠক, সমালোচক এবং ঐতিহাসিকের কাছে অমূল্য। কারণ একজন সাহিত্যিকের ডায়েরি শুধু সাহিত্যের আস্বাদ নিয়েই আসে না, তাতে থাকে নানান সম্ভাবনার অঙ্কুর। তার থেকে একদিকে যেমন আমরা জানতে পারি লেখক জীবনের অন্তরঙ্গ কথা, অন্যদিকে তার ভবিষ্যত–লেখনের একটা পূর্বাভাসও পেতে পারি, আবার প্রকাশিত কোনও সাহিত্যকর্মের প্রেক্ষাপট বা চরিত্রের উৎসের কথাও জানতে পারি। এই সাহিত্যিক মূল্য ছাড়া তার একটা ঐতিহাসিক মূল্যও রয়েছে। সমকালীন সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দেশের তথা বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে লেখকের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বা দৃষ্টিভঙ্গি ডায়েরির চেয়ে ভালো আর কোনও সাহিত্য-মাধ্যমে পাওয়া যায় না বোধহয়। আর তাই সময়, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আদর্শ, সংঘাত, আশা, নিরাশা এই সবকিছু নিয়ে একজন গোটা মানুষের ছবিটা ডায়েরিতে অনেক বেশি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। বনফুলের *মর্জিমহল*-ও তার ব্যতিক্রম নয়। *মর্জিমহল*-এর দুটি খণ্ডে একদিকে যেমন তিনি লিখেছেন শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, ও সংস্কৃতির কথা, অন্যদিকে তেমনই লিখেছেন ডাক্তারি, খেলাধুলো, প্রকৃতির কথা, মহৎ ব্যক্তিদের কথা, বই পড়ার কথা, পরিবারের কথা, দেশকে ভালোবাসার কথা। *মর্জিমহল* লেখার সময়কাল ১৯৭১ থেকে ১৯৭৯, 'সাতের দশক'। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর যে সময়কাল বাংলার সমাজ ও সাহিত্যকে আবিষ্ট করে রেখেছে আজকের তারিখেও তা এই সাতের দশক। মুক্তিযুদ্ধ এবং নকশাল আন্দোলনের উত্তাপে এ দশক উত্তাল হয়ে উঠেছিল। প্রায় এই গোটা দশকটা জুড়েই বনফুল নিভৃতে রচনা করে চলেছিলেন তাঁর 'মর্জিমহল'। রিপোর্ট লেখার ধরনে দিনের পর দিন ধরে যার পরতে পরতে বোনা হয়ে যায় সময়ের কুটিল জটিল জাল - সমকালীন নীতি, ধর্ম, দর্শন, সাম্যবাদ,

ঈশ্বরবিশ্বাস। শুধু রাজনীতি নয়, সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তিনি কড়া সমালোচক। নিজের ছোটোগল্প উপন্যাস নিয়ে যেমন ভাবছেন তেমনি আধুনিক কবিতার গুণাগুণ নিয়েও ভাবছেন। লেখকের সম্মান-দক্ষিণার প্রসঙ্গ তাঁকে যেমন ভাবায় তেমনই ভাবায় অপসংস্কৃতি। *মর্জিমহল*-এর ছত্রে ছত্রে এভাবেই স্রষ্টার সঙ্গে এসে মিলেছেন সমালোচক। বনফুল তো শুধু ছোটোগল্পকার নন, তাঁর পরিচয় বহুধা বিস্তৃত। তাঁর ডায়েরির পাশাপাশি তাঁর গদ্য সাহিত্যকে রেখে আমরা শুধু একজন সাহিত্যিক নয়, একটা রক্ত মাংসের গোটা মানুষকে সন্ধান করার চেষ্টা করবো এই গবেষণা প্রবন্ধে।সময় তাঁর মনে কতটা অভিঘাত ফেলছে বা সেই অভিঘাতের প্রভাব তাঁর সাহিত্য কতটা বহন করছে, সেটাও আমরা খুঁজে দেখার চেষ্টা করবো।

Discussion

আমাদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার বিদ্যায়তনিক পরিসরে ডায়েরি বিষয়টি অজ্ঞাত না হলেও কিছুটা অবহেলিত। সিলেবাস–নোট–পরীক্ষার হলেই তার ঘোরাফেরা, আপাত সীমাবদ্ধতা। এই আপাতত–উপেক্ষিত বিষয়টিই আমাদের এই গবেষণাপত্রের মূল উপজীব্য। এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যে প্রশ্নটি আমাদের মনে আসে তা হলো ডায়েরি কী? 'Diary' শব্দটির উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ 'diarium' থেকে। যার কাছাকাছি বাংলা প্রতিশব্দ হলো দিনলিপি। এই ল্যাটিন শব্দটির মূলে রয়েছে 'dies' শব্দটি, ল্যাটিন ভাষায় যার অর্থ দিন। 'কাছাকাছি' বলার কারণ 'diarium' শব্দটির আক্ষরিক অনুবাদ করলে পাওয়া যায় 'daily allowance'। মূলত ডায়েরি বা দিনপঞ্জি বলতে বোঝায় একটি দিন কীভাবে অতিবাহিত হলো বা একটি দিনের নানান ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী। যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দিন, মাস, বছর, বা সময়–চিহ্নিত। ডায়েরির বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে প্রায় কোনোকিছুই ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত হয় না।একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার কোনও যোগও থাকে না। কোনও ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর সে সম্পর্কে তার নিজের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াটুকুর কথা তিনি ডায়েরিতে লিখে রাখতে পারেন, তবে ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কৌতূহল মেটানোর কোনও দায় ডায়েরি লেখকের থাকে না। আর তাই মানুষের মনের অবরুদ্ধ আবেগ এবং তার ওপর সমসময়ের যে অভিঘাত তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল ডায়েরি।

ডায়েরি যে কোনও মানুষ লিখতে পারেন। তবে যখন কোনও সাহিত্যিক ডায়েরি লেখেন তখন তার আবেদন পাঠক, সমালোচক এবং ঐতিহাসিকের কাছে অমূল্য। কারণ একজন সাহিত্যিকের ডায়েরি শুধু সাহিত্যের আস্বাদ নিয়েই আসে না, তাতে থাকে নানান সম্ভাবনার অঙ্কুর। তার থেকে একদিকে যেমন আমরা জানতে পারি লেখক জীবনের অন্তরঙ্গ কথা, অন্য দিকে তার ভবিষ্যত–লেখনের একটা পূর্বাভাসও পেতে পারি, আবার প্রকাশিত কোনো সাহিত্যকর্মের প্রেক্ষাপট বা চরিত্রের উৎসের কথাও জানতে পারি। এই সাহিত্যিক মূল্য ছাড়া তার একটা ঐতিহাসিক মূল্যও রয়েছে। সমকালীন সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দেশের তথা বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে লেখকের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বা দৃষ্টিভঙ্গি ডায়েরির চেয়ে ভালো আর কোনও সাহিত্য-মাধ্যমে পাওয়া যায় না বোধহয়। Jeremy D. Popkin তাঁর *Philippe Lejeune: On Diary* বইতে ডায়েরি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন–

> "The diary is the point where life and literature meet..."[১]

অর্থাৎ ডায়েরি হলো লেখকের জীবনের সাথে তার সাহিত্যের সঙ্গম স্থল। স্রষ্টার নিভৃত যাপন তাঁর সাহিত্যে কিছুটা প্রতিফলিত হলেও তাঁর ব্যক্তি জীবনের কণ্টকক্ষত বা কুসুমগন্ধ অধরাই রয়ে যায়। সংশোধন, পরিমার্জন ইত্যাদি নানাবিধ রক্তচক্ষুর বেড়াজাল পেরিয়ে আসে যে সাহিত্য সেখানে স্রষ্টার মানসলোক কতটা উন্মোচিত হয় তা প্রশ্নাতীত নয়। সৃষ্টি ও স্রষ্টার জীবনের এই মিলিত অগ্রগতির চিহ্ন নীরবে বহন করে চলে ডায়েরি।

এখন প্রশ্ন হল কেন শুধুই ডায়েরি? আত্মজীবনী বা চিঠি নয় কেন? সেখানেও তো থাকে ব্যক্তিমানুষের কথা; থাকতে পারে সাহিত্য সৃজনের প্রেক্ষাপট, সমাজের চলচ্ছবি। তার প্রথম ও প্রধান কারণ সময়ের তাৎক্ষণিক অভিঘাত ও মনের অবরুদ্ধ আবেগের তীব্র-তীক্ষ্ণ প্রকাশ। একজন মানুষ যখন জীবনের সন্ধ্যালগ্নে দাঁড়িয়ে ফেলে আসা জীবনকে ফিরে দেখতে চান আত্মজীবনীর মধ্যে দিয়ে তখন তাঁর স্মৃতিতে–জমা-ধুলো আর মনের ওপর পড়া কালের-কোমল-স্পর্শ, সময়ের অভিঘাতে সৃষ্ট তাঁর তাৎক্ষণিক সুতীব্র অনুভূতিগুলোকে অনেকটাই নরম করে তোলে। ফলত ডায়েরির সেই ধারালো

অভিঘাত সেখানে পাওয়া যায় না। বনফুলের আত্মজীবনী 'পশ্চাৎপট' ও তার ব্যতিক্রম নয়। আর চিঠি তো প্রত্যুত্তর। সবসময় সব কথা মন খুলে বলা সেখানে হয়ে ওঠে না। হলেও, কখনও তাও সামাজিক বাধা নিষেধের অদৃশ্য বাহুবলে পরিমার্জিত।সেদিক থেকে ডায়েরি হলো নিজের কথা প্রকাশের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য জায়গা। কারণ লেখক যখন ডায়েরি লেখেন তখন সে ডায়েরি কখনও প্রকাশিত হতে পারে ভেবে লেখেন না; তা একান্তই নিজস্ব, ব্যক্তিগত। আর তাই সময়, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আদর্শ, সংঘাত, আশা, নিরাশা এই সব কিছু নিয়ে একজন গোটা মানুষের ছবিটা ডায়েরিতে অনেক বেশি স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। *মর্জিমহল*-ও তার ব্যতিক্রম নয়।

বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে বনফুলের সুবাস কখনও ম্লান হবার নয়। তাঁর এক একটি ছোটোগল্পের হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আমাদের চিত্ত ঝলমল করে ওঠে। তাঁর সাহিত্য পর্যালোচনার পরিসর যদিও এ গবেষণাপত্র নয়।আমরা আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি বনফুলের জীবনের শেষ আট বছরে লিখিত দিনলিপিতেই, যা তিনি লিখতেন 'মর্জিমহল' শিরোনামে। তবে প্রসঙ্গত আসবে তাঁর কিছু রচনার কথাও। **১৯৭১** সালের **১** জানুয়ারি থেকে **১৯৭৯** সালের **৩১** জানুয়ারি পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিনের সেই লিখনক্রম দিনাঙ্ক অনুসারে বিন্যস্ত এবং প্রায় প্রতিবেদন আকারে ক্রমপুঞ্জিত। এ দিনলিপি তাঁর একান্ত কথন।শেষের দিকে তা যেন হয়ে উঠেছে প্রয়াত স্ত্রীর প্রতি 'নিত্য বলা কথার উচ্চারণমালা', এক ধারাবাহিক মনোকথন। *মর্জিমহল*-এর দুটি খণ্ডে একদিকে যেমন তিনি লিখেছেন শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, ও সংস্কৃতির কথা, অন্য দিকে তেমনই লিখেছেন ডাক্তারি, খেলাধুলো, প্রকৃতির কথা, মহৎ ব্যক্তিদের কথা, বই পড়ার কথা,পরিবারের কথা, দেশকে ভালোবাসার কথা। তাঁর ডায়েরি তাঁর হাতে গোটা ভুবনের ভার তুলে দিয়েছে মনে হলেও তার বর্ণে বর্ণে রয়েছে ঝর্নার নির্বন্ধন লঘুতা।

আরও একবার মনে করে নেওয়া যাক মর্জিমহল লেখার সময়কাল **১৯৭১** থেকে **১৯৭৯**, 'সাতের দশক'। স্বাধীনতা ও দেশভাগের পর যে সময়কাল বাংলার সমাজ ও সাহিত্যকে আবিষ্ট করে রেখেছে আজকের তারিখেও তা এই সাতের দশক। মুক্তিযুদ্ধ এবং নকশাল আন্দোলনের বজ্র নির্ঘোষে এ দশক উত্তাল হয়ে উঠেছিল।প্রায় এই গোটা দশকটা জুড়েই বনফুল নিভৃতে রচনা করে চলেছিলেন তাঁর 'মর্জিমহল'। রিপোর্ট লেখার ধরনে দিনের পর দিন ধরে যার পরতে পরতে বোনা হয়ে যায় সমকালীন নীতি, ধর্ম, দর্শন, সাম্যবাদ, ঈশ্বরবিশ্বাস। তাঁর ডায়েরিতে বারবার আসে মুক্তিযুদ্ধের কথা। তার ব্যাপকতা, নৃশংসতা লেখককে কতখানি নাড়িয়ে দিয়েছিল তার প্রমাণ তাঁর ডায়েরি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং লাখো মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধার কথাও তিনি ব্যক্ত করেন তাঁর ডায়েরিতে। সঙ্গে সঙ্গে লিখে চলেন গোটা পৃথিবীর নীরবতার কথাও। ২০ই এপ্রিল, **১৯৭১** ডায়েরিতে লিখছেন –

> "পাইকারি হত্যাকান্ড চলছে পূর্ববঙ্গে। পৃথিবীর সবাই নির্বাক হয়ে দেখছে। প্রতিবাদে টুঁ শব্দটি করছে না কেউ। যেটুকু করছে সেটুকু না করলেও চলত। হায় রে মানব-সভ্যতা! শুক্রগ্রহের আভ্যন্তরীণ তাপ কত তাই নিয়ে গবেষণা করছেন বিজ্ঞানীরা। মানুষের প্রতি মানুষের পাশবিক অত্যাচারে তাদের টনক নড়ছে না। ভ্রূক্ষেপই করছে না কেউ।"[২]

২৬শে মার্চ লিখছেন –

> "বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের কোনও উপকারই হবে না কথার ফুলঝুরি কেটে বা রঙিন বচনের আতশবাজি উড়িয়ে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের পাশে যদি দাঁড়াতে পারি, তাহলেই সেটা কাজের মতো কাজ হবে। কিন্তু তা আমরা পারব না। আমরা বাক্য-বীরমাত্র, তার বেশি আর কিছুই নই।"[৩]

ওইদিনই ডায়েরিতে লিখে রাখছেন ইয়াহিয়া খান আর ভুট্টোর পূর্ব পাকিস্তান থেকে 'চম্পট' দেওয়ার কথা। লিখে রাখছেন সেখানে সৈন্যবাহিনীর পৌঁছ-সংবাদ, মিলিটারি ধর্ষণ, মুজিবুর রহমানের অন্তর্ধানের খবর। ৩ই এপ্রিল লিখে রাখছেন, 'মুজিবর রহমান এবং তাঁর অনুগামীরা বীরপুরুষ।' তাঁকে নিয়ে কবিতা লিখছেন, শিরোনাম দিচ্ছেন 'সহস্র সেলাম', যা *অমৃত* পত্রিকায় ২৬শে মার্চ প্রকাশিত হয়েছে বলে উল্লেখ করছেন। তারপরই আচমকা বলছেন –

> "একটি কথা কিন্তু ভুলতে পারছি না। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা এই কিছুদিন আগেই 'ইসলাম'-এর দোহাই দিয়ে হাজার হাজার হিন্দু বাঙালিকে খুন করেছিল, গৃহহারা করেছিল, তাদের নারীদের ধর্ষণ করেছিল, শিশু-হত্যাও করেছিল। নোয়াখালি, ক্যালকাটা কিলিং, এসবও দেখেছি আমরা।

গ্রীক পুরাণে প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী – Nemesis। তাঁরই পুনরাবির্ভাব ঘটল না কি! হিন্দুদের ওপর মুসলমানরা অত্যাচার করেছিল, তখন সেটাও একটা Nemesis। কারণ তার আগে হিন্দুরাও মুসলমানদের ওপর কম অত্যাচার করেনি। এই অত্যাচার আর পাল্টা – অত্যাচারই আমাদের ইতিহাস। Nemesis- এর লীলাই কি ইতিহাস তাহলে? আমরা যে ভগবানকে ডাকি তাঁর স্থান কি কোথাও নেই? না, ভুল বললাম। স্থান আছে, ধর্মগ্রন্থে।"[৪]

আমরা স্পষ্ট করে চিনে নিতে পারি বনফুলের বিশ্বাসকে। যে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে তিনি এত আলোচনা করেছেন ডায়েরিতে, যা তাঁকে এতটা নাড়িয়ে দিয়েছিল তার কোনও অভিঘাত তাঁর লেখক সত্তায় পড়বে না তা কি সম্ভব? স্মরণ করে নিতে পারি তাঁর 'অসাধারণ খবর' গল্পটিকে। গল্প কথক রিপোর্টার সহদেবের মধ্যে দিয়ে স্বয়ং লেখক যেন বলে ওঠেন –

"... যা অসাধারণ তাই সাধারণের পর্যায়ে নেমে এসেছে এখন। খুনের সংবাদ শুনে রক্ত গরম হয় না আজকাল, ভয়ে আঁতকেও উঠে না। যথারীতি খাই-দাই-ঘুমুই। স্ট্রাইক, স্ট্রাইক, চতুর্দিকে স্ট্রাইক আর 'বনধ'। এ সব অসাধারণ ব্যাপার, কিন্তু এ সবও গা সওয়া হয়ে গেছে, বাংলা দেশে লক্ষ লক্ষ লোক মরছে কিন্তু এটাও তো দিব্যি সহ্য করছি আমরা, এতেও আর চমক নেই।"[৫]

অননুকরণীয় বনফুলীয় ঢঙে গণ্ডার-চর্ম-পরিবৃত, ঠুঁটো জগন্নাথ পৃথিবীকে তীক্ষ্ণ শ্লেষ বাণে বিদ্ধ করেন লেখক। গল্পের শেষ অংশে এসে তা তীক্ষ্ণতর হয়ে ওঠে।গল্পকথক দেখেন বিরাট জ্যোতির্ময় এক স্ফটিকের সিঁড়ি আকাশ থেকে নেমে আসে তার বাড়ির ছাদে। সেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে শিশু কোলে একটি মেয়ে। যে মেয়েটি তাকে বলে –

"এই ছেলেটির মা আরও প্রায় পঞ্চাশজন লোকের সঙ্গে একটি পাট-ক্ষেতে লুকিয়েছিল পাক-সেনাদের ভয়ে। সেই রাক্ষস গুলো ক্ষেতের আশে পাশে ঘুরছিল। মায়ের কোলে এই ছেলেটি ছিল। হঠাৎ এ কেঁদে উঠল। সকলের ভয় হল কান্না শুনে পাক সেনারা ক্ষেতে ঢুকে পড়বে। মেরে ফেলবে তাদের সকলকে। তাই ওর মা ওর গলা টিপে মেরে ফেলল ওকে। এখন ওর মা ছেলের শোকে কাঁদছে। আপনি খবরটা ছেপে দিন ছেলে ওর মরে নি। আমার কাছে আছে। খুব যত্ন করে রেখেছি আমি ওকে...।"[৬]

'ঠুঁটো-জগন্নাথ' গোটা পৃথিবীর পিঠে এ সংবাদ চাবুকের মতো এসে পড়ে। বিমূঢ় বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই আমরা।আর স্পষ্ট হন বনফুল। কতটা অসহায়, কতটা সন্ত্রস্ত হলে একজন মা তার শিশু সন্তানের গলা টিপে হত্যা করতে পারে তা সচেতন মানুষ মাত্রেই জানেন। যদিও শহীদের রক্ত কখনও ব্যর্থ হয় না। ইতিহাসের কাছে, দেশমাতৃকার কাছে তা পরম যত্নেই রাখা থাকে। শহীদেরা মরে না।

মুক্তিযুদ্ধ ছাড়াও তৎকালীন ভারতীয় রাজনীতির নানা ঘটনা নিয়ে দিনের পর দিন ধরে প্রায় প্রতিবেদনের ভঙ্গিতে তাঁর ডায়েরিতে লিখতে থাকেন বনফুল। ইলেকশন নিয়ে জল্পনা, প্রবন্ধ, কার্টুন, বাঙালিদের ক্যাবিনেট মন্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে না পারার কারণ, 'গুন্ডা-তন্ত্র প্লাস কৌশল-তন্ত্র', মিডিয়ার গিরগিটিত্ব, জগজীবন রামের ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ, নতুন পার্টি কংগ্রেস অফ ডেমোক্রেসির গঠন, রাজনীতিবিদদের আদর্শহীনতা, ক্ষমতার লোভ, জরুরি অবস্থা, তার সম্পর্কে জগজীবন রাম ও মোরারজী দেশাই-এর মন্তব্যের সারবত্তাহীনতা, 'মিসা' আইন, সঞ্জয় গান্ধীকে হত্যার চেষ্টা, জগজীবন রামের ওপর হামলা, জরুরি অবস্থা, রাজনীতির পালাবদল, ইন্দিরা গান্ধীর পরাজয়, মন্ত্রীসভা গঠনে সমস্যা – একের পর এক পাতা জুড়ে বনফুল ফুটিয়ে তোলেন সমসময়ের কুটিল জটিল জাল। ২৮ মার্চ, ১৯৭৭ নবনির্বাচিত মন্ত্রিসভার প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ করে স্ত্রীর উদ্দেশে লিখলেন –

"লীলা, জগজীবন রাম, বহুগুণা, রাজনারায়ণ, ফার্নান্ডেজ মন্ত্রীসভায় যোগ দিলেন। এক হেঁসেলেই আঁশ নিরামিষ কোলাকুলি এবং মদের ডিক্যান্টার সবাই ঢুকল। জাতিভেদ তো অনেক আগেই উঠিয়ে দিয়েছি আমরা। সিগারের পাশে বিড়ি, এবং দামি জরদার পাশে খৈনি এখন আর বিসদৃশ নয়। আমরা আশা করব – এই 'বহু'র মধ্যে সেই চিরপ্রার্থিত কিন্তু চিরদুর্লভ একতার আবির্ভাব হোক।"[৭]

বলছেন বটে, কিন্তু তা যে ঘটবে না সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই তাঁর। গান্ধীবাদী নীতিতে বিশ্বাসী বনফুলের ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি আস্থা এবং মমত্ববোধ ও প্রকাশ পায় তাঁর ডায়েরিতে। ৬শে এপ্রিল, ১৯৭৭ ডায়েরিতে লিখছেন –

"লীলা, আজ Statesman এ ইন্দিরা গান্ধীর একটা ছবি বেরিয়েছে। ছবিটা দেখে খুব কষ্ট হল। রবীন্দ্রনাথ ওঁর নাম দিয়েছিলেন 'প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা', সত্যিই প্রিয়দর্শিনী। গুণ ও অনেক আছে। জনগণের যে ভোট তাঁকে একদিন

তুঙ্গে তুলেছিল সেই ভোটই তাঁকে আজ ধুলোয় ফেলে দিয়েছে। জনতার বিচার সব সময় নির্ভুল নয়। এই জনতা বিদ্যাসাগরকে নির্যাতন করেছিল, লিংকনকে খুন করেছিল।"[৮]

এরপরেই ইন্দিরা গান্ধীর ইমারজেন্সি শাসন সম্পর্কে যখন তিনি বলেন – "ডিকটেটারশিপ না থাকলে এ দেশে ভালো কাজও করা যায় না"[৯] তখন বনফুলের রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে আমাদের কোনও সংশয়ও থাকে না। ১৯৭৭ এর ২২ জুন বামফ্রন্টের জয়ের খবর জানিয়ে ডায়েরিতে লিখছেন –

"কাগজে মনকে উদ্দীপ্ত করার মতো কোনও খবর নেই। বাম-পন্থীরা কাল শপথ নিয়ে শাসনভার গ্রহণ করলেন। সব রাজবন্দীরা ছাড়া পাবে। কাগজওলারা ঠারে–ঠোরে বামপন্থীদের খোশামোদ করছেন। চিরকালই যা হয় তাই হচ্ছে। বিষণ্ণ মন নিয়ে কিছু লিখতে ইচ্ছে করছে না।"[১০]

আবার একদিন পরেই 'কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের' নব–গঠিত বিধানসভায় একজন মন্ত্রী হওয়ার খবরে কিছুটা আশান্বিতও হয়ে উঠছেন।

এদেশের রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর স্পষ্ট মতামত ও ক্ষোভও লিখে রাখেন ডায়েরিতেই –

"... পেটে খিদে, মনে হিংসে, চোখে কাম আর লোভ, সাহিত্যে কেচ্ছা – এইসব যোগ করলে যা হয় তারই নাম এখানে রাজনীতি।... এ দেশে রাজনীতি মানে খেয়োখেয়ি, লেংগি-মারামারি, পয়সা আর খাবার দিয়ে লোক জুটিয়ে মাঠে সভা করা এবং দেশবাসীকে ক্রমাগত ধাপ্পা দেওয়া। লম্বা লম্বা প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করা। তারপর তাদের ভোট নিয়ে গদিতে উঠে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো এবং যতটা সম্ভব টাকাকড়ি হাতিয়ে, আত্মীয়–স্বজনদের চাকরি করে দিয়ে। গাড়ি বাড়ি করে, খবরের কাগজে নানা ওজুহাতে নিজেদের প্রশংসা এবং ছবি ছাপিয়ে দিন কতক নপর-চপর করা – এরই নাম এদেশে রাজনীতি।"[১১]

তাঁর এই মনোভাবের প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি তাঁর সাহিত্যেও। 'অগ্নিশ্বর', 'ত্রিবর্ণ', 'স্বপ্নসম্ভব' ইত্যাদি উপন্যাস থেকে 'যোদ্ধা', 'ছুঁড়িটা', 'ভোটার সাবিত্রী বালা' ইত্যাদি ছোটোগল্প, সবেতেই তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায়কে আমরা দেখি সমাজের হীনতার বিরুদ্ধে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার মত জ্বলে উঠতে। দেশের প্রকৃত সেবক এই মানুষটি তাই বলেন –

"স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বাঙালী একদিন ইংরেজের সঙ্গে লড়েছিল এইবার তার দুর্নীতির সঙ্গে লড়া উচিত। যদি দরকার হয় তার জন্য প্রাণ দিক।"[১২]

একই সুর ধ্বনিত হয় *হাটে-বাজারে* উপন্যাসের ডাক্তার সদাশিব ভট্টাচার্যের আত্মকথনেও। স্বাধীন ভারতের নানা দুর্নীতি নিয়ে সরব হন তিনি –

"ইংরেজদের হাত থেকে শাসনভার আজকাল যাঁদের হাতে গেছে তাঁরা শুধু যে অকর্মণ্য তাই নন, তাঁরা অসাধুও। এঁদের শাসনকালে দেশের সত্যিকার উন্নতি কিছু হয় নি। স্কুল কলেজে ছেলেদের শিক্ষা হয় না। তারা গুণ্ডা হচ্ছে। শিক্ষকদের মারে, ভদ্রলোকদের হুমকি দেয়, মেয়েদের প্রকাশ্যে রাস্তায় অপমান করে, বিনা টিকিটে ট্রেনে বাসে চড়ে। পুলিশ এদের কিছু বলে না। কর্তৃপক্ষ এদের তোয়াজ করেন, কারণ ইলেকশনের সময় এদের উপরই ভরসা তাঁদের।"[১৩]

দেশীয় নেতাদের এই অনাচার, ভোট নিয়ে নানা কারচুপি, অসততাকে তীব্র ব্যঙ্গে দেখিয়েছেন বনফুল তাঁর গল্পেও। নেতারা নিজের আখেরটুকু গোছাতেই ব্যস্ত। সাধারন মানুষকে নিয়ে ভাববার তাদের সময় কোথায়! শিক্ষা, স্বাস্থ্য মানুষের ন্যূনতম চাহিদাটুকুও পুরণ হয় না। দেশ অন্ধকারে ডুবে যায় আর নেতাদের ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়তে থাকে। শুধু নির্বাচনের আগে কিছু মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট আদায় করে নেওয়া। তারপর পাঁচ বছর তাদের দেখা মেলা ভার। এই অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে তাঁর 'ভোটার সাবিত্রীবালা'-

"আপনাকে ভোট দেব? কেন? কি উপকার করেছেন আমার? আপনি যখন গদিতে ছিলেন – তখন আমার বিদ্বান স্বামী সামান্য ভিখিরির মতো মারা গেছেন। আমার বড় ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে পারি নি, শেষে সে গুণ্ডা হয়ে ছুরির ঘায়ে মারা গেল। ছোট ছেলেটা মল যক্ষ্মায়, তার কোনও চিকিৎসা হ'ল না, সর্বত্র ঘুষ চায়। আপনাদের ভোট দেব কেন, কাউকেই ভোট দেব না –

ভোটপ্রার্থী ভদ্রলোক বলিতে গেলেন – 'কিন্তু দেখুন গণতন্ত্রে'-

কিন্তু সাবিত্রী তাঁহাকে কথা শেষ করিতে দিল না।
তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল – 'বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে' –" [১৪]

দুর্নীতির মুখোশটা এভাবেই টেনে ছিঁড়ে দেন বনফুল। এভাবে তো আজও আমরা বলতে চাই, কিন্তু পারি কই! বনফুল কিন্তু পারেন। তাঁর ভেতরে বাইরে কোথাও সততার কোনও অভাব নেই। ডায়েরিতে তিনি যা লেখেন তাই তিনি প্রকাশ করেন তাঁর সাহিত্যেও। তাঁর "ছুঁড়িটা" গল্পেও আমরা তারই প্রতিধ্বনি পাই। স্বাধীনতা উত্তরকালের ভ্রষ্ট নেতাদের অনাচারকে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন বনফুল এই গল্পে। খুলে দিতে চেয়েছেন তাদের মহানুভবতার মুখোশ। চরিত্রহীন এক নেতা যখন চরিত্রবান হওয়ার কথা বলেন, বক্তৃতা দিতে গিয়ে, ভোট আদায় করতে গিয়ে যখন সৎ-চরিত্রকে মূলধন করার কথা বলেন তখন আমাদের এই গোটা সমাজ ব্যবস্থার ফাঁপা, ঘুন ধরা কাঠামোটাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে আমাদের চোখের সামনে। সামনে আসে পুলিশের দুর্নীতির কথাও। মকর-রাজের হাঁ-করা-মুখের সামনে অসহায় এক মা-মেয়ের করুণ আত্মসমর্পণের কাহিনি নির্মম ভাষায় বলে চলেন লেখক এই গল্পে। গোটা সমাজ ব্যবস্থাটাই দুর্নীতির শিকার হয়ে গেছে। এখানে বেঁচে থাকতে গেলে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে বাঁচতে হবে। যে লড়াইয়ের অস্ত্র হিসেবে অনেকেই বেছে নেয় কৌশলকে। বনফুল তাঁর 'যোদ্ধা' কিংবা 'মুগুর' গল্পে সেই দিকটিতেও আলোকপাত করেন। মেয়েরাও তাঁর কাছে ব্রাত্য নয়। ১৯৭৭-এর ২৩শে এপ্রিল থেকে আজ ২০২২ সাল- চারটে দশক পেরিয়ে এসেও এর সামান্যতম কিছু বদলও তো দেখলাম না আমরা। ডায়েরিতে যেভাবে তিনি ইন্দিরা গান্ধী বা কেয়া চক্রবর্তীর কথা বলেন সেই একই দৃঢ়তায়, একই মুগ্ধতায় নির্মাণ করেন তাঁর ঝিনুক ('ত্রিবর্ণ'), তনিমা সেন ('ত্রিবর্ণ''), রুমি ('স্বপ্নসম্ভব'), অন্তরা সেন ('অগ্নি'), বিশাখা ('পঞ্চপর্ব') কিংবা জুবেদাদের ('পঞ্চপর্ব')। তাঁর উপন্যাসের মেয়েরা আধুনিক যুগের মেয়ে। তারা তাদের সময়ের রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। সমাজের দুর্নীতি, কু-সংস্কার-এর বিপক্ষে দাঁড়ায় তারা যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব ও জোরের সঙ্গে। তাদের নিজস্ব মতামতকেও স্বাধীন ভাবে জানাতে কুণ্ঠিত হয়না কোথাও তারা। সামাজিক-রাজনৈতিক নানা আন্দোলনেও যোগ দেয় সক্রিয় ভাবেই। নারী প্রগতির এই চিত্রও তিনি বুনে চলেন তাঁর লেখায়। শুধু দেশের নয় গোটা বিশ্বের সমকাল সম্পর্কে যে তিনি ওয়াকিবহাল তার খোঁজও আমরা পাই তাঁর ডায়েরিতে। চু এন লাই থেকে মাও ৎসে তুং, নজরুল-জসীমউদ্দীন থেকে ঋত্বিক ঘটক–অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত– কাউকেই তিনি দূরে সরিয়ে রাখেন না।

শুধু রাজনীতি নয় সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তিনি কড়া সমালোচক। চেতনার 'মারীচ সংবাদ' তাঁর ভালো লাগছে না একথা যেমন তিনি জানাচ্ছেন, তেমনি ব্রেখটের *ককেশিয়ান চক সার্কেল* ভালো লাগার কথাও জানাতে ভোলেন না। উদয় শঙ্করের বিখ্যাত প্রযোজনা 'Shankarscope', যার সম্পর্কে বলতে গিয়ে খোদ উদয়শঙ্কর বলেছেন 'my dream has come true at last', তা দেখে এসে নিজের খারাপ লাগার কথা লিখে রাখছেন দ্বিধাহীনভাবে -

"আজ শঙ্কর–স্কোপ দেখলাম। খুব খারাপ লাগল। ম্যাজিক, স্টান্ট, কতকগুলো কুৎসিত ছেলেমেয়ের দাপাদাপি – এ ছাড়া বিশেষ কিছু নেই।... বড় আর্ট গ্যালারির স্রষ্টা উদয়শঙ্কর সস্তা মনোহারীর দোকান খুলে খদ্দের জোটাবার চেষ্টা করছেন দেখে দুঃখ হল।"[১৫]

'উত্তরণ' থিয়েটার দেখে এসে সেখানে সাবিত্রী আর সরযূর অভিনয়ের প্রশংসা করছেন। প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করছেন অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তীর কথা, তাঁর মৃত্যুর খবরে কতখানি আঘাত পেয়েছেন তাও কোথাও গোপন করেন না –

"লীলা, আজ সকালে আর একটি মৃত্যু সংবাদ কাগজে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে আছে। অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী গঙ্গায় ডুবে মারা গেছে। সে স্কটিশে অধ্যাপিকা ছিল। চাকরি ছেড়ে যোগ দিয়েছিল রঙ্গমঞ্চে। তুমিও তার অভিনয় দেখেছ একাধিকবার। 'ভালোমানুষ' বইয়ে তার অভিনয় চমৎকার লেগেছিল। 'নটী বিনোদিনী'ও চমৎকার করত। সব শেষ হয়ে গেল।"[১৬]

প্রসঙ্গত বলেন কুট্টির কার্টুন এর কথা। বাদ যায় না সিনেমার প্রসঙ্গও। নানা সময়ে তাঁর নিজের গল্প থেকে তৈরি হওয়া সিনেমার কথা বলেন তিনি, বলেন তার কন্ট্রাক্ট সাইনের কথা। শুধু নিজের গল্প থেকে তৈরি সিনেমা নয়, ভাই ঢুলু অর্থাৎ পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'অজস্র ধন্যবাদ', 'ধন্যি মেয়ে' ইত্যাদি ছবির কথাও বলছেন। সমকালীন বাংলা সিনেমার গুণগত মান সম্পর্কে ও তাঁর অভিমত তিনি লিখে রাখেন ডায়েরিতে –

> "খুব ভালো বইও আমাদের দেশে চলে না। চলে জবজবে সেন্টিমেন্টের বই, যৌণ-গন্ধী বই, ভাঁড়ামির বই। ভালো নাটকের সমঝদার এ দেশে বেশি নেই। তাই ভালো নাটক এ দেশে লেখা হয় না। ইউনেস্কোর 'চেয়ার' এ দেশে চলবে না। 'রাইনোসেরাস' চলেনি।"[১৭]

শুধু দেশের নয়, বিদেশের সিনেমা থিয়েটার সম্পর্কেও যে তিনি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল সেটাও ডায়েরি-ই আমাদের জানিয়ে দেয়। বহুল আলোচিত 'স্ত্রী' সিনেমা দেখে এসে কড়া ভাষায় তার সমালোচনাও করেন; পাশাপাশি উত্তম কুমারের অভিনয়ের প্রশংসাও–

> "বহু-বিজ্ঞাপিত 'স্ত্রী' সিনেমা কাল সন্ধ্যায় দেখলাম। সেকালের বড়োলোকের ছেলেরা যে কেবল মদ মেয়েমানুষ আর বেলেল্লাগিরি নিয়ে থাকত এবং তাদের বিবাহিত স্ত্রীদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করত – এই বস্তাপচা কাহিনী নিয়ে সিনেমা। বড়োলোকের জিদি চরিত্রহীন ছেলে মাধব দত্তের ভূমিকায় উত্তমের অভিনয় চমৎকার হয়েছে। বাকি সব সো সো। যেখানে সেখানে গান দেওয়াতে বইটা বম্বে-মার্কা হয়ে গেছে।"[১৮]

টলিউড আর বলিউড সম্পর্কে বনফুলের দৃষ্টিভঙ্গিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এ মন্তব্যে।

কখনও ক্ষণ মুহূর্তকে ভর করে ছড়া লিখছেন, আপাত চটুল কবিতা রচনা করছেন, আবার পরক্ষণেই নাতনির ছেলেমানুষী কীভাবে ডায়েরি লেখায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে তার সাবলীল বর্ণনা দিচ্ছেন। নিজের ছোটোগল্প উপন্যাস নিয়ে যেমন ভাবছেন তেমনি আধুনিক কবিতার গুণাগুণ নিয়েও ভাবছেন। লেখকের সম্মান দক্ষিণার প্রসঙ্গ তাঁকে যেমন ভাবায় তেমনই ভাবায় অপসংস্কৃতি। এ অনুষঙ্গে তাঁর মনে আসে সংবাদপত্রের বানান ভুলের কথা, প্রশ্ন তোলেন রমণীদের ফটোগ্রাফ সংবাদপত্রে এভাবে কেন স্থান পায়? সতীকান্ত গুহর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির ঔচিত্য থেকে শরৎচন্দ্রের প্রণয় সম্পর্কে রাধারাণী দেবীর সাক্ষ্যের ঔচিত্য তাঁকে ভাবায়।

> "স্বপ্ন দেখছেন তার উল্লেখ থাকছে, কিন্তু স্বপ্নের ডায়েরি হয়ে উঠছে না তাঁর দিনলিপি, যৌনতার এলাকা পেরিয়ে তাঁর রোজনামচা এগিয়ে চলেছে ফুল পাখি ছবির রাজ্যে। পাখির সূত্রে এসে পড়েছেন সালিম আলী। ফুলের মধ্যে গোলাপ, ছবির মধ্যে লীলা দেবী।"[১৯]

সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব তাঁকে ভাবায়। মাইকেল ছাড়া আর কোনও উল্লেখযোগ্য বাংলাভাষী লেখকের শেকড় কেন কলকাতায় নেই, তার উত্তর খুঁজে চলেন তিনি। *মর্জিমহল*-এর ছত্রে ছত্রে এভাবেই স্রষ্টার সঙ্গে এসে মিলেছেন সমালোচক। আর তাই বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় নামক মানুষটিকে সম্পূর্ণ করে জানতে গেলে তাঁর ডায়েরিকে পাশে সরিয়ে রাখলে চলবে না।

গীতিকবিতা যেমন একলা কবির কথা, তেমনই ডায়েরি হলো এক একলা মনের কথা; ব্যক্তিবিশেষের নিজের কথা, নিজের অনুভূতি। আর এই বিশেষের ওপর যখন পড়ে বিশ্বের প্রভাব তখন সেই বিশেষ অনুভূতি হয়ে ওঠে বৈশ্বিক; তা যুগের, সময়ের। আর সাহিত্যিক মননে সেই অভিঘাতের তীব্র তীক্ষ্ণ প্রত্যক্ষ রূপটি চিত্রিত হয় তাঁর ডায়েরিতে। তার জন্য যে তাঁকে কট্টরপন্থী, কোনও এক বিশেষ রাজনৈতিক পার্টির দাগিয়ে দেওয়া সাহিত্যিক হতে হবে তার কোনও মানে নেই।আসলে কোনও মানুষই তো অ-রাজনৈতিক বা সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি-নিরপেক্ষ হতে পারে না।তাই আপাত রাজনীতি-থেকে-দূরে-থাকা মানুষের চোখেও ধরা পড়ে সমকালীন রাজনৈতিক প্রতিবেশ।এর পাশাপাশি সৎ, সময়ের প্রতি দায়বদ্ধ,সচেতন লেখকের রচনায় উঠে আসে সমকালীন সংস্কৃতিও। বনফুলও পরম যত্নে, সমবেদনায়, দায়িত্ব নিয়ে *মর্জিমহল*-এর পাতায় পাতায় বুনে চলেন সমসময়ের এক নির্বাক দলিল। দাম তার সামাজিক, মূল্য তার নান্দনিক।

তথ্যসূত্র :

১. Popkin, Jeremy D. & Rak, Julie (Ed.), Philippe Lejeune: On Diary, The University of Hawai's Press, 2009, page 2
২. বনফুল, 'বনফুলের ডায়েরি' : মর্জিমহল, প্রথম খণ্ড, বাণী শিল্প, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ৩৩
৩. ঐ, পৃ. ২৯
৪. ঐ, পৃ. ২৯-৩০
৫. বনফুল, 'অসাধারণ খবর', বনফুল রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৪

বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০০

৬. ঐ, পৃ. ৩০১

৭. বনফুল, 'বনফুলের ডায়েরি' : মর্জিমহল, দ্বিতীয় খণ্ড, বাণী শিল্প, কলকাতা, এপ্রিল ২০১১, পৃ. ২৫১

৮. ঐ, পৃ. ২৫৭

৯. তদেব

১০. ঐ, পৃ. ৩০২

১১. ঐ, পৃ. ২৬৭

১২. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, 'অগ্নীশ্বর', বনফুল রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, সরোজমোহন মিত্র (সম্পা.), গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ৩০ শ্রাবন ১৩৮৮, পৃ ১০৭

১৩. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, 'হাটে-বাজারে', বনফুল রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, সরোজমোহন মিত্র (সম্পা.),গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ৩০ শ্রাবন ১৩৮৮, পৃ ৪৮

১৪. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, 'ভোটার সাবিত্রীবালা', বনফুল রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড, সরোজমোহন মিত্র (সম্পা.), গ্রন্থালয় প্রা. লি., কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৪, পৃ ৩১৪-৩১৫

১৫. বনফুল, বনফুলের ডায়েরি : মর্জিমহল, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১৬. বনফুল, বনফুলের ডায়েরি : মর্জিমহল, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

১৭. ঐ, পৃ. ২৫৯

১৮. বনফুল, বনফুলের ডায়েরি: মর্জিমহল, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

১৯. বীতশোক ভট্টাচার্য, 'অনুকথন', বনফুলের ডায়েরি: মর্জিমহল, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৩